অন্তিম গতিঃ

আল্লার পতিতালয়

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

অন্তিম গতি ঃ আল্লার পতিতালয়

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

পাঠক নারীরা একজন বেহেস্তে যাবে না কেন? সমস্ত মুসলিমরা মৃত্যুর পর বেহেস্তে যাবেই কেউই নরকে যাবে না। যে মুসলমান অন্ততঃ জীবনে একবার "লাই লাহা ইল্লাল্লা মমমদুর রসুলুল্লা" এই কলেমা একবার বললেই খুন, জখম, রাহাজানি, বলাৎকার যাহা কিছু করুক আল্লা ৭ খুন মাফ করে ১ নম্বর বেহেস্তে পাঠাবেন। কারণ সে কোরান হাদিস আল্লার বাণী বিশ্বাস করেছে। সত্যি কি তাই? আল্লা মুসলিমদের লোভ দেখিয়েছেন স্বর্গের বা বেহেস্তের।

পাঠক যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে আপনার বিচার করার ক্ষমতা আছে কি? আপনার পদপ্রান্তে প্রার্থনা রইল।

ইতি—লেখক

Antim Gati : Allar Patitalaya
By Dr. Radhashyam Brahmachari
Price : Rupees Ten only

প্রকাশক
লেখক

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০১২
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ২০১৪

মূল্য ঃ ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ
সুবোধ প্রেস, ৬, ডালিমতলা লেন, কলকাতা-৬

প্রাপ্তিস্থান
তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

জাহেলিয়া ঃ

আরবী শব্দ জাহেলিয়া-র অর্থ হল অজ্ঞতার অন্ধকার। ইসলামি মতে আল্লা পৃথিবীতে কোরান নাযেল বা প্রকাশ করার আগে এই পৃথিবীতে বিরাজ করছিল জাহেলিয়া বা অজ্ঞতার অন্ধকার। কোরান হল জ্ঞানের আলো। তাই আল্লা কোরান নাযেল করে অজ্ঞতা ও মিথ্যার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোককে পৃথক করেছেন। তাই কোরানের আরেক নাম হল ফোরকান বা আলো ও অন্ধকারের পৃথককারী অথবা সত্য ও মিথ্যার পৃথককারী। যদিও মুসলমান মোল্লা ও মৌলভীরা এই মিথ্যা কথা প্রচার করে চলেছে যে, ইসলামের অর্থ হল শান্তি। আরবী শব্দ ইসলাম (প্রকৃত উচ্চারণ এছলাম)-এর প্রকৃত অর্থ হল আত্মসমর্পণ। বিশেষ অর্থে আল্লার কোরান ও আল্লার রসুল মহম্মদের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।

অপরদিকে ইসলাম হল এমন একটি মতবাদ, প্রতিটি মুসলমানকে যার পুরোটাই গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের এইটুকু বিশ্বাস করি, আর এই টুকু বিশ্বাস করি না, এরকম কখনোই চলবে না। কোরান ও হাদিসে যা লেখা আছে, তার ওপর প্রতিটি মুসলমানের থাকতে হবে অন্ধ বিশ্বাস। তাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যেষ একমাত্র কোন ও হাদিসেই সত্য আছে, তাই তাকে কখনোও প্রশ্ন করা চলবে না। তাই প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হল, কোরান ও হাদিসে যা লেখা আছে তাকে অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নেওয়া। আল্লা তো কোরান ও হাসিসে সত্য প্রকাশ করেই দিয়েছেন। তাই নতুন করে সত্য আবিষ্কার করতে যাওয়া বৃথা পরিশ্রম মাত্র। তাই প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হল, আল্লার সেই সত্যক বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া, তার ব্যাখ্যা করা ও তার প্রচার করা।

এই ভারতের মুসলমানদের প্রায় সকলেই এক কালে হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছেন। যেই মুহূর্তে তারা মুসলমান হয়েছেন, সেই মুহূর্তেই তাদের স্বাধীন চিন্তার অধিকার বিসর্জন দিয়ে কোরানের অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক কথাবার্তা ও আদেশ-উপদেশকে অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নিতে হয়েছে। অবশ্য তারা ইতিমধ্যে চিন্তা-ভাবনা গুলোকে কোরান ও হাদিসের বিধি অনুযায়ী পাল্টে নিয়েছেন। তার থেকেও বড় কথা হল, এতদিন ধরে কোরান ও হাদিসের গোলামী করতে করতে তারা স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছেন। এইসব মুসলমানদের মধ্যে বেশিরভাগই নিরক্ষর। তাই কোরান ও হাদিস পড়ে দেখার ক্ষমতা তাদের নেই। মোল্লা মৌলভীরা যা বোঝায় তারাও তাই বোঝেন। মোল্লা মৌলভীরা তাদের বোঝায় যে, ইসলাম হল সব থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর আল্লাই হল একমাত্র সাচ্চা ভগবান। হিন্দুরা ও অন্যান্য ধর্মের লোকেরা যেই সব ভগবানের পূজা করে, তাঁরা সবাই হল মেকি ভগবান। যারা আল্লা ও কোরানে বিশ্বাস করে না, তারা সব অজ্ঞতার অন্ধকার বা জাহেলিয়ায় বাস করছে। এই কারণে তারা তাদের পূর্বপুরুষদেরও ঘৃণার চোখে দেখে, কারণ তারা সবাই ছিল জাহেলিয়ায় নিমগ্ন কাফের।

এই কারণে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন, যাতে করে সাধারণ মুসলমানদের পক্ষে এই দুই ধর্মের মধ্যে কোনটা ভাল ও কোনটা খারাপ, তা নিরপেক্ষভাবে বিচার বিবেচনা করতে ও বুঝতে সুবিধা হয়।

শুরুতেই একটা বিষয় বলে রাখা উচিত এবং তা হল, অতি আদিমকালে মানুষ খাদ্য সংগ্রহের পর্যায়ে ছিল। তখন মানুষ বনে বনে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করত এবং তাই দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। পরে সে যখন পশুকে পোষ মানাতে শিখল, তখন থেকে শুরু হল যাযাবর পশুপালকের পর্যায়। সেই সময় পর্যন্ত মানুষের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। যত দিন পশুর খাবার ঘাস পাওয়া যেত, ততদিন তারা এক জায়গায় থাকত এবং ঘাস ফুরিয়ে গেলে স্থানান্তরে চলে যেত। এই যাযাবর জীবন শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানার্জনের পক্ষে সহায়ক ছিল না। মনুষ্য সভ্যতার শুরু হল সেই দিন, যে দিন মানুষ কৃষিকাজ ও কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রা শুরু করল। কৃষির জমি মানুষকে স্থায়ীভাবে এক জায়গায় বসতি করতে বাধ্য করল, বা মানুষের একটা স্থায়ী ঠিকানা হল। এই স্থায়ী ঠিকানাই কালে আধুনিক রাষ্ট্র, বিচার ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থার জন্ম দিল। কৃষিকাজ অনেক লোকের অন্ন বস্ত্রের যোগান দিতে সমর্থ হবার ফলে সমাজের কিছু লোক জ্ঞান বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে সময় দিয়ে সক্ষম হল। ফলে গড়ে উঠল আধুনিক মানব সভ্যতা। কাজেই বলা চলে যে, কৃষিই হল মানব সভ্যতার সূতিকাগার।

আজ এটা সর্বজনবিদিত যে, ঋগ্বেদ হল মনুষ্য রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থ। পণ্ডিতেরা এ ব্যাপারেও এক মত যে, ঋগ্বেদের যুগের অনেক আগেই ভারতীয় সমাজ পশুপালকের স্তর অতিক্রম করে কৃষিভিত্তিক সমাজে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু যেই আরব দেশে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল সেখানে মরুময় জমি ও বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার জন্য কৃষিকাজ এক অসম্ভব ব্যাপার। তাই আরব্য সমাজ আজও পশুপালকের স্তরেই পড়ে আছে, কৃষিভিত্তিক সমাজে উন্নীত হতে পারেনি। আরব্য সমাজ আজও যাযাবর পশুপালকের সমাজ। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, হিন্দু ধর্ম উদ্ভুত হয়েছে কৃষিভিত্তিক সুসভ্য সমাজে এবং ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে আরবের অসভ্য পশুপালক সমাজে। কাজেই ইসলাম হিন্দু ধর্ম থেকে নিকৃষ্ট হতে বাধ্য। হিন্দু ধর্মের দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি যা কিছু আছে, তার রচনাকারীরা ছিলেন অতিশয় শিক্ষিত ও অত্যন্ত মানবিক ও আধ্যাত্মিক সব ব্যক্তিগণ, যাদের বলা হয় ঋষি। কিন্তু ইসলামের প্রবর্তকরা ছিলেন অশিক্ষিত ও নিরক্ষর আরবের পশুপালক।

আরবের পশুপালকদের জীবন নির্বাহ করতে হয় খেজুর ও মাংস খেয়ে। তাই তাদের সমাজে পশু হত্যা করা আমাদের বাজার হাট করার মত একটা দৈনন্দিন ব্যাপার। এই কারণে আরবের লোকদের মধ্যে নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা সহজাত ব্যাপার। এই নিষ্ঠুর নৃশংস সমাজে ইসলামের জন্ম হবার ফলে ইসলামের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে এই নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা।

আরব্য সমাজ যে আজও পশুপালকের স্তরে পড়ে রয়েছে, তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। একটি কৃষি ভিত্তিক সমাজের পক্ষে সৌর বছর গণনা করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই, কারণ সূর্যের বার্ষিক আবর্তনের সঙ্গে ঋতু পরিবর্তন হয় যার সঙ্গে কৃষি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু আরবের সমাজ আজও পশুপালক স্তরে পড়ে আছে বলে তারা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম চান্দ্র হিজরি ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে চালিয়ে যেতে পারছে। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার নয় যে, হিন্দু ধর্ম উন্নত কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে উদ্ভুত হবার ফলে তা ইসলামের থেকে অনেক উন্নত।

কিন্তু বর্তমান স্বল্প পরিসরে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের একটা সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই মাত্র দুটি বিষয়ে হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের একটা তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করা চলতে পারে। এই দুটি বিষয় হল প্রথমত (১) এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টির রহস্য এবং দ্বিতীয়ত (২) মানুষের অন্তিম গতি। একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই প্রবন্ধের অবতারণা। আমাদের দেশের যে সব হিন্দু এককালে প্রধানত প্রাণের ভয়ে মুসলমান হয়েছেন, তাঁরা সচরাচর বলে থাকেন যে, হিন্দু ধর্মের থেকে ইসলাম শ্রেষ্ঠ তো বটেই, পৃথিবীর আর সমস্ত ধর্মের মধ্যে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই সব ব্যক্তিদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন এই প্রবন্ধটি নিরপেক্ষ মন দিয়ে একটু পাঠ করেন এবং এই দুটি ধর্ম সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত তৈরি করার চেষ্টা করেন।

হিন্দু ধর্মের মূল অবধারণা ঃ

হিন্দু ধর্মের মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি হল এই দৃশ্যমান পরিবর্তনশীল বিশ্ব জগতের মূলে রয়েছে একটি অপরিবর্তনশীল ও সর্বব্যাপী চৈতন্যময় সত্ত্বা, যাঁর নাম ব্রহ্ম। সংস্কৃত বৃহৎ শব্দ থেকে ব্রহ্ম শব্দের উৎপত্তি। যার থেকে বৃহৎ আর কিছু নেই তিনি ব্রহ্ম। এই জগতে দৃশ্য অদৃশ্য, জয় প্রাণী, যা কিছু আছে তা সবই ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন। অপরদিকে, ব্রহ্ম হল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার অতীত। ব্রহ্ম হলে—**ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নানৈর্দেবৈঃ**। অর্থাৎ, ব্রহ্মাকে চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কান দিয়ে শোনা যায় না এবং অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও তাকে জানা যায় না।

সৃষ্টি ব্যাপারে হিন্দু শাস্ত্র বলছে, ৪৩,২০,০০০ বছরে এক মহাযুগ হয় এবং ১০০০ মহাযুগ বা ৪৩২ কোটি বছরে হয় ১ কল্প। ১ কল্প সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার দিন এবং পরবর্তী ১ কল্প ব্রহ্মার রাত্রি। ব্রহ্মার দিনকে বলে সৃষ্টি বা সর্গ এবং ব্রহ্মার রাত্রিকে বলে প্রলয় বা প্রতিসর্গ। ব্রহ্মার দিনে ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই বিশ্ব জগতে রূপান্তরিত হন এবং ব্রহ্মার রাত্রিতে ব্রহ্ম আবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার অতীত অবস্থায় ফিরে যান। কাজেই হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে ৪৩২ কোটি বছর পর পর সৃষ্টি ও প্রলয় হয়ে চলেছে। তাই শ্রীমদ্ভাবদ্‌গীতা বলছে,

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ।। (৮ঃ১৭)

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃপ্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে।। (৮ঃ১৮)

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরগামে।। (৮ঃ১৯)

—অর্থাৎ এক সহস্র (মহা) যুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং এক সহস্র (মহা) যুগের ব্রহ্মার এক রাত্রি। যিনি ইহা জানেন তিনিই দিবা রাত্রির প্রকৃত তত্ত্ব জানেন (৮ঃ১৭)। সমগ্র ভূতসমুদয় ব্রহ্মার দিবাগমে অব্যক্ত থেকে অভিব্যক্ত হয় এবং তাঁর রাত্রি সমাগমে সেই অব্যক্তেই লয় হয় (৮ঃ১৮)। হে পার্থ! প্রকৃতি বশবর্তী সেই ভূতসমুদয় পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মার রাত্রিসমাগমে লয় হয় এবং দিবাগমে পুনরায় উৎপন্ন হয় (৮ঃ১৯)।

এই গণনার ভিত্তি হল, প্রতি ১ মহাযুগ বা ৪৩,২০,০০০ বছর পর পর আকাশের সমস্ত গ্রহ এক সরলরেখায় মেষ রাশির অন্তর্গত অশ্বিনী নক্ষত্রে মিলিত হয়। সমস্ত হিন্দু জ্যোতিষ গ্রন্থ ও স্মৃতি গ্রন্থে এই কথা লেখা আছে। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে নিউ ইয়র্কের অ্যাস্ট্রলজিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি দ্বারা (Astrological Research Society) দ্বারা প্রকাশিত এনসাইক্লোপিডিয়া অফ অ্যাস্ট্রলজি (Encyclopaedia of Astrology) গ্রন্থ বলছে, "This *Mahayuga* of the Hindus is a period of approximately 43,20,000 years, in which they say that all the planets recur at nearly the same position. The astronomer Stuart showed that this is correct and the period is 4,319,936.8663 years; at the end of which Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter and Saturn return to a position in the fixed Zodiac about 20 degrees behind where they started. He found this also applies to new planets Uranus and Neptune and that an increase in the period of Pluto of only one part in 100,000, or 0.001 per cent, will also bring it to recurrence."

বর্তমান প্রসঙ্গে এই সমস্ত বিষয় উত্থাপন করার উদ্দেশ্য হল এটা বোঝানো যে, হিন্দু ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব কোন অযৌক্তিক ছেলে ভুলানো গল্প নয়। হিন্দু ধর্ম বলে না, যে কোন এক সকালে ভগবানের মনে ইচ্ছা হল তিনি জগৎ সৃষ্টি করবেন এবং সেই অনুসারে কোন কাঁচামাল ছাড়াই শূন্য থেকে এই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করে ফেললেন। এ ব্যাপারে খ্রীষ্ট মত বলছে যে, ৪০০৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের ২৩শে অক্টোবর সকাল ৯টায় গড তাঁর সৃষ্টি কার্য শুরু করেন এবং ছয় দিনের মধ্যে তিনি পৃথিবী ও স্বর্গ সৃষ্টি করেন এবং সপ্তম দিন রবিবার তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন। সেই রকম ইসলাম বলছে যে কোন এক শনিবার আল্লা তাঁর সৃষ্টি কার্য শুরু করেন

এবং ছয় দিনের মধ্যে তিনি পৃথিবী, আকাশ ও আকাশের ওপরে সাত স্বর্গ সৃষ্টি করেন। সপ্তম দিন শুক্রবার তিনি প্রথম মানব ও মানবী আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করেন এবং আরবের নবী মহম্মদ ছিলেন আদমের ৯০ তম বংশধর। কাজেই দুই পুরুষের মধ্যে ৩০ বছরের ব্যবধান ধরে নিলে বলতে হয় যে, আল্লা তাঁর সৃষ্টিকার্য শুরু করার ২৭০০ বছর পর মহম্মদের জন্ম হয়। নবী মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে, তাই হিসাব করলে দেখা যাবে যে, আজ থেকে ৪১৩৭ বছর আগে আল্লা পৃথিবী, আকাশ ও সপ্ত স্বর্গ সৃষ্টি করেছিলেন। বলে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলাম বা খ্রীষ্টমতের প্রবক্তাদের এই বিশ্ব (Universe) ও তার বিশালতা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না। তাঁদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে। তাই তাঁদের গড় বা আল্লার জ্ঞানও সীমাবদ্ধ ছিল পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে।

উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে গড পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আজ থেকে ৬০১৩ বছর আগে এবং আল্লা এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আজ থেকে ৪১৩৯ বছর আগে। আগেই বলা হয়েছে যে, হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে ৪৩২ কোটি বছরে ১ কল্প হয়। তেমনি ৩০ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪৮ হাজার বছরে হয় ১ মন্বন্তর। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে বর্তমানে শ্বেতবরাহ কল্প চলছে এবং শ্বেতবরাহ কল্প শুরু হবার পর থেকে ৬টা মন্বন্তর পার হয়ে বর্তমানে ৭ম মন্বন্তর বৈবস্বত চলছে। সব হিসাব করলে দেখা যাবে যে, আজ থেকে ১৯৭ কোটি ১২ লক্ষ ২১ হাজার ১০৯ বছর আগে বর্তমান কল্প বা সৃষ্টি শুরু হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের মতে আজ থেকে প্রায় ২০০ কোটি বছর আগে মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) হয়েছিল। কাজেই বলা চলে যে, হিন্দু শাস্ত্রের সঙ্গে বর্তমান বিজ্ঞান খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন। খ্রীষ্টমত ও ইসলাম অনুসারে সৃষ্টির আগে আল্লা বা গডের কোন কাজ ছিল না। ৫০০০ কি ৬০০০ বছর আগে আল্লা বা গড সক্রিয় হয়ে এই আকাশ, পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। কিন্তু শেষ বিচার বা কেয়ামতের দিন তিনি তাঁর এই সৃষ্টিকে নিজে হাতে ভেঙে ফেলবেন। মানুষদের মধ্যে কেউ কেউ অনন্ত স্বর্গে আবার কেউ কেউ অনন্ত নরকে চলে যাবে। কাজেই গড বা আল্লার কাজ ফুরিয়ে যাবে। আল্লা বা গড আবার নিষ্কর্মা হয়ে পড়বেন। তরোয়াল দিয়ে প্রাণের ভয় না দেখালে কোন বুদ্ধিমামন ও যুক্তিবাদী মানুষ এইসব ছেলে ভুলানো গালগল্পে বিশ্বাস করতে রাজী হবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু হিন্দু কাল গণনা চক্রাকার এবং খ্রীষ্ট বা ইসলামি মতের মত রৈখিক নয়। তাই হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে সৃষ্টি এবং প্রলয় চক্রাকারে পথে অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে। কোনদিন শেষ হবে না।

ইসলাম ও খ্রীষ্টমতের মত সেমিটিক ধর্মগুলির সঙ্গে হিন্দু ধর্মের আরও একটা বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামের ভগবান অনেকটাই মানুষের মত। তাঁরা অনেক দূরে, স্বর্গে বাস করেন এবং সেখান থেকেই তাঁরা পার্থিব ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ইহলামি

মতানুসারে আল্লার উচ্চতা ৬০ হাত এবং তাঁর মুখমণ্ডল মানুষের মত। এছাড়া তাঁর রয়েছে ক্রোধ, হিংসা, লোভ, সুখ দুঃখ ইত্যাদি মানুষের মত গুণাবলী। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে এ রকম প্রাকৃত গুণ সম্পন্ন আল্লা বিনাশশীল হতে বাধ্য। পক্ষান্তরে হিন্দুর ঈশ্বর নিরাকার ও নির্‌গুণ। তাঁর মাত্র একটি গুণ আছে তা হল তিনি চৈতন্যময়। হিন্দু এই নিরাকার ও চৈতন্যময় ঈশ্বরের নাম ব্রহ্ম বা আত্মা। আগেই বলা হয়েছে যে, এই ব্রহ্ম বা আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার অতী ত এবং তিনি সর্বব্যাপী। ব্রহ্ম হলেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। সৃষ্টিকালে এই ব্রহ্ম থেকেই এই দৃশ্যমান বিশ্ব জগত উদ্ভূত হয় এবং প্রলয়কালে এই দৃশ্যমান বিশ্ব জগত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার অতীত ব্রহ্মে বিলীন হয়। ব্রহ্ম তাঁর চৈতন্য শক্তির দ্বারা সমস্ত পার্থিব ঘটনাবলী ভিতর থেকেই নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণকারী কোন ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না। তাই মুণ্ডকোপনিষদে বলা হচ্ছে—

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।। (২ ঃ ১ ঃ ৩)

অর্থাৎ, এই (এক ব্রহ্ম) হইতে প্রাণ জাত হয় এবং মন, সর্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও সকলের আধারভূতা ক্ষিতি সম্ভূত হয়।

হিন্দু ধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল পুনর্জন্মের অবধারণা। এই অবধারণার মূল ভিত্তি হল, মানুষের জৈবিক দেহ বিনাশশীল কিন্তু তারা আত্মা অবিনাশী। কাজেই যখন কোন ব্যক্তি মারা যায় তখন তার দেহের বিনাশ, কিন্তু আত্মার বিনাশ হয় না। আত্মা তখন একটি নতুন দেহকে আশ্রয় করে। কাজেই প্রত্যেক বার মৃত্যুর পর মানুষ নতুন দেহে নতুন জীবন শুরু করে এবং এই প্রক্রিয়া প্রকৃতির নিয়মের বশেই চলতে থাকে। নতুন জন্ম আগের জন্মের থেকে ভাল হবে না মন্দ হবে, তা নির্ভর করে পূর্বজন্মের কর্মের ওপর। আগের জন্মে ভাল কাজ করলে পরের জন্ম ভাল হবে এবং আগের জন্মে খারাপ কাজ করলে পরের জন্য মন্দ হবে। তাই গীতায় বলা হচ্ছে—

ন জায়তে মৃয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।। (২ ঃ ২০)

অর্থাৎ, এই আত্মা কখনও জন্মান না বা মরেনও না, এবং আত্মার অস্তিত্ব উৎপত্তিসাপেক্ষ নয়, কারণ আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, সনাতন এবংশাশ্বত; শরীর বিনষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হন না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।। (২ ঃ ২২)

অর্থাৎ, মানুষ যেমন পুরানো বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তেমনই পুরানো শরীরকে পরিত্যাগ করে নতুন শরীর গ্রহণ করে।

অন্তিম গতি হিসাবে হিন্দু কি আকাঙ্খা করে ঃ

এই পার্থিব জীবনের কর্তব্য হিসাবে হিন্দু ধর্ম প্রত্যেক মানুষের সামনে চারটি লক্ষ্য রেখেছে। এদের বলা হয় পুরুষার্থ। এই চারটি পুরুষার্থ হল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এদের মধ্যে অর্থ ও কাম হল বৈষয়িক এবং ধর্ম ও মোক্ষ হল আধ্যাত্মিক। এই চার পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষই হল শ্রেষ্ঠ আবং প্রতিটি হিন্দুর অন্তিম কামনা হল মোক্ষ লাভ করা। বা বলা যায় যে, প্রতিটি হিন্দুর অন্তিম গতি হল মোক্ষ। মোক্ষ শব্দের অর্থ হল মুক্তি। বিশেষ অর্থে জন্ম ও পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি। যখন মানুষের মনে এই উপলব্ধি হয় যে, এই বিশ্ব জগতে একমাত্র ব্রহ্মই আছেন এবং আমরা যা দেখছি, যা শুনছি তা সবই এক ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ মাত্র। এবং সেই হিসাবে সে নিজেও ব্রহ্ম, তখন তাঁকে বলে ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মবিদ।

মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানী হলে কি হয়? মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানী হলে সে জন্ম ও পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি পায়। মানুষ ভোগের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করকতে পারে না, ত্যাগের মধ্য দিয়ে তা সম্ভব। ত্যাগ, তিতিক্ষা ও নিরন্তর সাধনার দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব। হিন্দু ধর্মে এর থেকেও অনেক বড় কথা বলে। হিন্দু ধর্ম হল—**ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি**। অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানী নিজে ব্রহ্মই হয়ে যায়ন। **যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি এবং মুনের্বিজানিতাত্মা ভবতি গৌতম**—অর্থাৎ, হে গৌতম, শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল মেশালে যেমন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞাণীও ব্রহ্মের সাথে বিলীন হয়ে যান। অর্থাৎ, কোন সাধক ব্রহ্মজ্ঞানী হলে তিনি নিজেই ব্রহ্ম বা ভগবান হয়ে যান।

এই হল সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী যা একমাত্র হিন্দু ধর্মই বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থিত করতে পেরেছে। একমাত্র হিন্দু ধর্মই মানুষকে প্রথমে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে এবং সেই মনুষ্যত্ব থেকে দেবতে.ব উন্নীত করার কথা শুনিয়েছে। পৃথিবীর আর কোন ধর্ম মানুষকে এই কথা শোনাতে পারেনি। কাজেই একজন হিন্দুর কাছে শ্রেষ্ঠ বা চরম আধ্যাত্মিক প্রাপ্তি হল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে নিজেকে মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত করা এবং মোক্ষ বা মুক্তিলাভ করা।

একজন মুসলমানের কাছে চরম আধ্যাত্মিক প্রাপ্তি কি?

একজন মুসলমানের কাছে চরম আধ্যাত্মিক প্রাপ্তি হল আল্লার স্বর্গ বা জান্নাতে প্রবেশ করা এবং অনন্তকাল সেখানে বসবাস করা। অবশ্য এজন্য তার কোন ত্যাগ, তিতিক্ষা বা সাধনার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু কলমা পড়ে মহম্মদের সত্যধর্ম গ্রহণ করা এবং আল্লার কোরান ও মহম্মদের নবীত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলাম ধর্মে ৬টা শপথ বাক্য বা কলেমা আছে, যার মধ্যে প্রথম কলেমার নাম হল কলেমা তৈয়ব। এই কলেমা তৈয়ব বলছে—**লা ইলাহা ইল্লাল্লা, মহম্মদুর রসুলুল্লা** বা আল্লা ছাড়া উপাস্য নেই এবং মহম্মদ আল্লার রসুল (বা পয়গম্বর)। ইসলামে এই কলেমা তৈয়বের গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু এই কলেমায় বিশ্বাস

করার জন্যই সব মুসলমান আল্লার জন্নাতে প্রবেশ করার অধিকার অর্জন করবে। একদিন আল্লা সমস্ত মানুষের শেষ বিচার বা কিয়ামৎ-এর অনুষ্ঠান করবেন। ভয়ঙ্কর সেই কিয়ামতের দিন আল্লা সবাইকে কবর থেকে উত্থিত করে বিশাল হাসরের ময়দানে সমবেত করবেন। আল্লা সবাইকে নগ্ন ও ছুন্নৎ বিহীন (Uncircumcised) ভাবে উত্থিত করবেন (সহিহ মুসলীম-৬৮৪৪, ৬৮৪৬, ৬৮৪৭)

আল্লার বিচারের পদ্ধতি খুবই অদ্ভুত। এই পৃথিবীতে জীবিতকালে কে ভাল কাজ করেছে আর কে খারাপ কাজ করেছে, আল্লা সে বিচার করবেন না। আল্লা প্রথমেই দেখবেন যে, তাদের মধ্যে কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়। যারা মুসলমান এবং কলেমা তৈয়বে বিশ্বাস করেছে, আল্লা তাদের সমস্ত দুষ্কর্ম ও পাহাড় প্রমাণ পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তাদের ওপর তার অসীম দয়া (রহমৎ) বর্ষণ করবেন এবং তাদের সবাইকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেবেন। আর যারা মুসলমান নয়, কাফে, তাদের সবাইকে তিনি নরকের আগুনে ঠেলবেন। সেই কাফেরদের মধ্যে যদি অতিশয় পুণ্যাত্মা ব্যক্তিও থাকেন, তারাও আল্লার রহমৎ পাবে না মুসলমান না হবার অপরাধের জন্য তাদেরও আল্লা নরকের আগুনে ফলে দগ্ধ করবেন। প্রত্যেক বার দগ্ধ করার পর তিনি নতুন চামড়ার সৃষ্টি করে দেবেন এবং আবার দগ্ধ করবেন (কোরান-৪/৫৬)। একদিন নবীর স্ত্রী আয়েশা নবীকে প্রশ্ন করলেন, "আল্লার আসুল, নারী পুরুষ সবাইকে কি নগ্ন অবস্থায় উত্থিত করা হবে?" নবী মহম্মদ বললেন, "হ্যাঁ"। তখন আয়েশা বললেন, "তখন যদি একে অন্যের দিকে তাকায়!" এই বেয়াড়া প্রশ্ন শুনে মহম্মদ বেশ বিরক্ত হলেন এবং বললেন, 'সে দিন পরিস্থিতি এত ভয়ঙ্কর থাকবে যে, একে অন্যের দিকে তাকাবার কথা মনে হবে না।" (সহিহ মুসলীম-৬৮৪৪)। ভয়ঙ্কর সেই কিয়ামতের দিন আল্লা সূর্যকে পশ্চিম দিকে উদিত করবেন তাকে পৃথিবীর খুব কাছে নিয়ে আসবেন। এত কাছে নিয়ে আসবেন যে, সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব হবে প্রায় ১ মাইল। (সহিহ মুসলীম-৬৮৫২)

আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লার অদ্ভুত বিচারের ফলে সব মুসলমান, অত্যন্ত পাপচারী ও পতিত মুসলমানও আল্লার জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে। অপরদিকে সমস্ত অ-মুসলমান কাফেরের স্থান হবে নরকে। আল্লার দৃষ্টিতে সমস্ত কাফেরের মধ্যে হিন্দুরা হল সর্বাপেক্ষা হীন। কারণ তারা মূর্তি পূজা করে। এইভাবে মূর্তি পূজা করে তারা আল্লা শরীক খাড়া খাড়া করছে বা শির্ক পাপ করছে। তাই তারা হল ঘৃণ্য মুশরিক। এই কারণে আল্লা হিন্দুদের সব থেকে যন্ত্রণাময় নরক হাভিয়া-তে পাঠাবেন। আল্লা সর্বজ্ঞানী, তাই তিনি নানানরকম কাফেরদের জন্য ৭ রকমের নরক তৈরি করে রেখেছেন। কোন নরকে আগুন পায়ের পাতা পর্যন্ত, কোন নরকে তা গোড়ালি পর্যন্ত, কোন নরকে হাঁটু পর্যন্ত, কোন নরকে কোমর পর্যন্ত। কিন্তু হাভিয়া নরকে আগুন হবে মাথার তালু পর্যন্ত এবং সেই আগুন পৃথিবীর আগুনের

চাইতে ৭০ গুণ বেশি যন্ত্রণাদায়ক হবে। এই ব্যাপারে কোরান বলছে, "তোমরা এবং আল্লার বদলে তোমরা যাদের উপাসনা কর, সেগুলো তো নরকের ইন্ধন, তোমরাই ওতে প্রবেশ করবেন"।(২১ ঃ ৯৮)। কিন্তু খ্রীষ্টান ও ইহুদীরা মূর্তিপূজা করে না বাল তারা কম যন্ত্রণাদায়ক নরকে স্থান পাবে।

অপর দিকে সর্বজ্ঞানী আল্লা মুসলমানদের জন্য ৮ রকমের জান্নাত বা স্বর্গ তৈরি করে রেখেছেন। এরা হল (১) খেলদ, (২) দার-এস-সালাম, (৩) দারুল, (৪) আদান, (৫) নঈম, (৬) মারোয়া, (৭) আলুইন ও (৮) ফেরদৌস। এদের মধ্যে খেলদ হল সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং ফেরদৌস হল সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বর্গ। এর সর্বোৎকৃষ্ট স্বর্গ ফেরদৌস শুধু নবীদের জন্য, গাজীদের জন্য আর জিহাদে নিহত শহীদদের জন্য সুরক্ষিত রাখা আছে। যে মুসলমান জীবনে কমপক্ষে একটা কাফের হত্যা করেছে, তারাই হল গাজী। এইসব ব্যাপারে কোরান বলছে, **"আমি তোমাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) সবরকম পাপ ক্ষমা করে দেব এবং সম্মানের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেব"** (৪।৩১)। **"আল্লা তাঁর শরিক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, এ ছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যারা আল্লার শরিক (খাড়া) করে তারা মহাপাপ করে"** (৪।৪৮) **"তাঁরা (আল্লার) পরিবর্তে যারা অন্য দেবদেবীর উপাসনা করে, তারা হল পথভ্রষ্ট"** (৪।১১৬)। **"আল্লা বিশ্বাসীদের সমস্ত দুষ্কর্ম মাফ করে দেবেন"** (৩৯।৩৫)।

আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লা বিশ্বাসীদের জন্য ৮ রকমের স্বর্গ তৈরি করে রেখেছেন এবং পদমর্যাদা হিসাবে বিভিন্ন মুসলমান বিভিন্ন জান্নাতে স্থান পাবে। তাই **"মানুষ মাথা উঁচু করে যেমন আকাশের চাঁদ দেখে, সেইরকম নিচস্থ স্বর্গের সাধারণ মানুষ মাথা উঁচু করে উচ্চস্থ স্বর্গের মানুষদের দেখবে"** (সহীহ্ মুসলীম-৬৭৮৮, ৬৭৮৯)। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করে আল্লার পথ বেছে নেয়নি, তারা সবাই নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

আল্লার নরকের আগুন হবে পার্থিব আগুনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। **"সেই আগুনের তীব্রতা হবে পার্থিব আগুনের ৭০ গুণ"** (সাহীহ মুসলীম-৬৮১১)। সর্বজ্ঞ আল্লা বিভিন্ন রকম কাফেরদের জন্য ৭ রকমের নরক তৈরি করে রেখেছেন। আল্লা কাফেরদের অনন্তকাল ধরে নরকের আগুনে দগ্ধ ককরবেন। কিন্তু একবার দগ্ধ করার পর চামড়া পুড়ে গেলে পরের বার দগ্ধ করার সময় তাদের জ্বালা যন্ত্রণা তত বেশি হবে না। তাই সর্বজ্ঞ আল্লা **"প্রত্যেক বার দগ্ধ করার পর আবার নতুন চামড়া সৃষ্টি করে দেবেন, যাতে তারা অনন্তকাল ধরে চরম যন্ত্রণা ভোগ করতে পারে"** (কোরান-৪।৫৬)। **"আল্লার স্বর্গে এবং আল্লার নরকে কারও কোনদিন মৃত্যু হবে না"** (সাহীহ মুসলীম-৬৮২৭, ৬৮২৯)। **"এই ঘোষণা শুনে স্বর্গবাসীদের মনে আনন্দ অনেক বেড়ে যাবে, কিন্তু নরকবাসী কাফেরদের মনে দুঃখ বাড়বে"** (সহীহ মুসলীম-৬৮৩০)।

তাছাড়া আল্লার নরকে (দোজখে) কাফেররা বিচিত্র রকমের আকার ধারণ করবে। যেমন, **"তাদের দাঁতগুলো হবে উহুদ পাহাড়ের মত এবং তাদের গায়ের চামড়া এত মোটা হবে যে তা পার হতে একজন অশ্বারোহীর তিন রাত্রি সময় লাগবে"** (সহীহ মুসলীম-৬৮৩১)। সেই সঙ্গে **"তাদের দুই কাঁধের মধ্যে কার দূরত্ব পার হতেও একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন রাত্রি সময় লাগবে"** (সাহীহ মুসলীম-৬৮৩২)। মহম্মদ তাঁর স্বর্গ ভ্রমণ বা মেরাজ-এর সময় দেখেছেন যে, **"বনি কাব-এর ভাই আমর বিন লুহায়ার পেট থেকে সব নাড়ি ভুড়ি বেরিয়ে গেছে এবং সে সেগুলো টানতে টানতে নরকের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে আরবে মূর্তিপূজা চালু করেছিল, তাই তার এই শাস্তি"** (সহীহ মুসলীম-৬৮৩৮)।

স্বর্গবাসী মুসলমানদের কথা ঃ

যখন কাফেররা নরকের আগুনে জ্বলে পুড়ে চরম যন্ত্রণা ভোগ করবে, তখন মুসলমানরা মহোল্লাসে স্বর্গে প্রবেশ করে মহা আনন্দ ফূর্তিতে রত থাকবে। **"আল্লা তাদের সমস্ত রকমের দুষ্কর্ম মাফ করে দেবেন"** (৩৯।৩৫)। আল্লার জান্নাতে রয়েছে বিশুদ্ধ দুধের নদী, বিশুদ্ধ মধুর নদী এবং বিশুদ্ধ সুরার নদী। মুসলমানরা যখন ইচ্ছা, যত ইচ্ছা তা পান করবে। মুহাজির (যারা মক্কা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে মদিনায় এসেছিল) ও অনসারদের (মদিনার সেই সব মুসলমান মুহাজিরদের সাহায্য করেছিল) মধ্যে যারা সঠিক পথ দেখিয়াছিলা এবং যারা তাদেরঅনুসরণ করেছিল, আল্লা তাদের প্রতি প্রসন্ন। **"তাদের জন্য তিনি জান্নাত সৃষ্টি করেছেন, যার নীচে প্রবাহিত হচ্ছে নদী। তারা সেইখানে অনন্তকাল ধরে বাস করবে। এটাই মহান সাফল্য"** (৯।১০০)। **"তিনি তোমাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচে বয়ে যাচ্ছে নদী। জান্নাতের মনোরম উদ্যানে, সুরম্য অট্টালিকায় তোমরা বাস করবে। এটাই মহান সাফল্য"** (৬১।১২)। **"এই হল জান্নাত যা বিশ্বাসীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। যার নীচে দিয়ে প্রবাহিত হবে বিশুদ্ধ জলের নদী, বিশুদ্ধ দুধের নদী, স্বর্গীয় সুরার নদী এবং বিশুদ্ধ মধুর নদী। তারা সেখানে খাবে সুস্বাদু স্বর্গীয় ফলমূল আর পাবে আল্লার ক্ষমা"** (৪৭।১৫)।

নবী মহম্মদের এক বিশ্বস্ত অনুচরের নাম ছিল আবু হোরাইরা। সেই আবু হোরাইরা বর্ণিত একটি হাদিস বলছে যে, মহান আল্লা বলেছেন, **"আমি আমার সৎ কর্মশীল বান্দাদের জন্য যা (জান্নাত) তৈরি করে রেখেছি তা আজ পর্যন্ত কেউ চোখে দেখেনি, কানে শোনেনি বা কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু কোরান তার সাক্ষী আছে। কেউ কোনদিন ভাবতেও পারেনি যে কি ভোগ সুখের ব্যবস্থা আমার বান্দাদের জন্য তৈরি করে গোপন করে রেখেছি, আমার বান্দারা যা তাদের সুকর্মের পুরস্কার স্বরূপ পাবে"** (সহীহ মুসলীম-৬৭৭৯, ৬৭৮০, ৬৭৮১, ৬৭৮২, ৬৭৮৩)।

আল্লার জান্নাতে একটা রাস্তা আছে যেখানে স্বর্গবাসীরা প্রতি শুক্রবার বেড়াতে যাবে। তখন "**উত্তর দিক থেকে শীতল বাতাস বইবে। সেই বাতাসের সুগন্ধ স্বর্গবাসীদের শরীর ও জামাকাপড় সুগন্ধিত করবে এবং তাদের সৌন্দর্য ও চেহারার শ্রীবৃদ্ধি করবে**" (সহীহ মুসলীম-৬৭৯২)। "**জান্নাতে এক বিশাল গাছ থাকবে যার ছায়া অতিক্রম করতে একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর ৩০০ বছর সময় লাগবে**" (সহীহ মুসলীম-৬৭৮৪, ৬৭৮৫, ৬৭৮৬ ও ৬৭৮৭)। "**জান্নাতে এক বিশাল তাঁবু থাকবে যা একটা মুক্তাকে খোদাই করে বানানো হয়েছে এবং তার বিস্তার হবে ৬০ মাইল**" (সহীহ মুসলীম-৬৮০৪)। "**সেই তাঁবুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে ৬০ মাইল**" (সহীহ মুসলীম-৬৮০৫)। "**সেই তাঁবুর উচ্চতাও হবে ৬০ মাইল এবং তাঁবুর প্রতিটি কোণে একটি করে পরিবার বসবাস করবে অথচ কেউ কাউকে দেখবে পাবে না**" (সহীহ মুসলীম-৬৮০৬)। "**আল্লার জান্নাতে সাইবান ও জাইবান নামে দুটো নদী থাকবে। স্বর্গের অন্যান্য নদীর মধ্যে স্বর্গবাসীরা এই দুটো নদীকে ইউফ্রেটিস ও নীল নদের মত দেখতে পাবে**" (সহীহ মুসলীম-৬৮০৭)।

মুসলমানরা আল্লার জান্নাতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে খেতে দেওয়া হবে মাছের ভাজা কোলজে। সেই কোলজে এত বিশাল হবে যে একটা কোলজে ৫০ হাজার লোক খেতে পারবে। এই কোলজে ভাজা খাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শারীরিক গঠন ও দেহের কাজকর্ম ভীষণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। প্রত্যেক স্বর্গবাসীর উচ্চতা হয়ে যাবে ৬০ হাত এবং তারা যা খাবে তা সব হজম হয়ে যাবে। তাই তাদের আর মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হবে না। সর্দি কাশি ইত্যাদি কোন রোগব্যাধিও তাদের হবে না। তারা সবসময় উৎকৃষ্ট রেশমের পোষাক ও সোনার অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে সোনার পালঙ্কে বিশ্রাম করবে আর নানারকম ভোগ বিলাসে রত থাকবে। তাদের ব্যবহার্য আসবাব পত্র এমনকি দাঁত খোচাবার কাঠিখানাও সোনা দিয়ে তৈরি হবে। তারা অতি উপাদেয় নানারকম জান্নাতি খাবার খাবে। তাছাড়া দুধের নদী থেকে দুধ, মধুর নদী থেকে মধু ও সুরার নদী থেকে উৎকৃষ্ট সুরা পান করবে। আগেই বলা হয়েছে যে তারা যা খাবে তা সবই হজম হয়ে যাবে, তাই মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হবে না। শুধু পুরুষ মুসলমানরাই আল্লার জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসলমান রমণীরা সেখানে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে না। তারা সকলেই নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। স্বর্গবাসী মুসলমান পুরুষদের কারও বয়স ৩২ বছরের বেশি হবে না। বয়স বাড়তে বাড়তে যেই ৩২ বছরে পৌঁছাবে, তখন বয়স বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে।

তাই কোরান বলছে— "**সেখানে থাকবে সুশোভিত উদ্যান ও দ্রাক্ষাকুঞ্জ। আর থাকবে সুউন্নত বক্ষ বিশিষ্ট ও যৌবনে পরিপূর্ণ স্বর্গীয় রমণীগণ**" (৭৮।৩১)। "**আমি তাদের (স্বর্গবাসীদের) ফলমূল ও মাংসের বিভিন্ন খাবার দেব, যা তারা পছন্দ করে। সেখানে তারা একে অন্যকে পানপাত্র দেবে, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না,**

এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবে না। তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে মুক্তা সদৃশ কিশোরীরা। আর খাবে সুন্দ্র পাত্রে করে স্বর্গীয় সুরা। সেই সুরা যে যত ইচ্ছা খাবে, কিন্তু তাতে কোন মাথার যন্ত্রণা হবে না। আর থাকবে হ্রি.ণ নয়না সুন্দরীগণ" (৫২।২২-২৪)। **"নিশ্চয় সৎশীলরা পরম স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। তারা সুজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে। তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে। মোহর করা পাত্র হতে তাদের বিশুদ্ধ সুরা পান করানো হবে। আর তা হবে কস্তুরীর সিলমোহর। এবং তা তসনিম্ বা জান্নাতের পানি মিশ্রিত"** (৮৩।২২-২৭)।

মুসলমানরা জান্নাতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শরীর ও চেহারার অদ্ভুত রকম পরিবর্তন হবে। এব্যাপারে সহীহ্ মুসলীমের একটি হাদিস বলছে, **"যে সব মুসলমানরা প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল এবং যারা দ্বিতীয় দলে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশের নক্ষত্রের মত চমৎকার"** (৬৭৯৩)। শুধু বাইরের চেহারাই নয়, তাদের শরীরের ক্রিয়াকর্মও হবে অদ্ভুত। **"তাদের মুখে থুথুর উৎপত্তি হবে না এবং তারা সর্দি বা কাশিতে ভুগবে না। তারা যা খাবে তা ১০০ শতাংশ হজম হয়ে যাবে, তাই মলত্যাগ বা প্রস্রাবের দরকার হবে না। তাদের ব্যবহার্য সব কিছু হবে সোনা কিংবা রূপো দিয়ে তৈরি। এমন কি তাদের চিরুনিখানাও হবে সোনা দিয়ে তৈরি। তাদের শরীরের ঘাম থেকে মৃগনাভীর গন্ধ ছড়াবে এবং তাদের দু জন করে পত্নী থাকবে আর তারা এত সুন্দরী হবে যে শরীর মধ্য দিয়ে হাড় পর্যন্ত দেখা যাবে। তাদের হৃদয়ে কোনরকম বিবাদ ও শত্রুতা থাকবে না"** (সহীহ্ মুসলীম-৬৭৯৭, ৬৭৯৮,৬৮০০)। **"জান্নাতবাসীরা কখনো মল মূত্র ত্যাগ করবে না, তারা কোনরকম ব্যধি বা সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হবে না। তারা থুতুও ফেলবে না। তাদের চিরুনিখানাও হবে সোনার এবং তাদের গায়ের ঘাম হবে মৃগনাভীর সুগন্ধে ভরপুর। তাদের পত্নীরা হবে সুনয়নী কুমারী এবং সেখানে সবাই আদি পিতা আদমের ৬০ হাত আকৃতি পাবে"** (সহীহ্ মুসলীম-৬৭৯৫, ৬৭৯৬)।

জান্নাতের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্ণনা করতে আল্লা কোরানে বলছেন, **"এই দিন জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে। তারা ও তাদের সঙ্গিনীগণ সুশীতল ছায়ায় থাকবে এবং সুসজ্জিত আসনে বসবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে সুমিষ্ট ফলমূল এবং বাঞ্ছিত অন্য সব কিছু"** (৩৬।৫৫-৫৭)। **"সংযমীরা জান্নাতে ভোগ বিলাসে থাকবে। তাদের প্রতিপালক তাদের যা দেবেন তারা তা উপভোগ করবে এবং তিনি তাদের জাহান্নমের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন, এবং তাদের বলা হবে, তোমরা যা করতে তার প্রতিদান স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক। আমি আয়তলোচনা হুরীদের সঙ্গে তোমাদের মিলন ঘটাবো"** (৫২।১৭-২০)। **"সেদিন অনেকেরই মুখণ্ডল হবে আনন্দোজ্জ্বল। তারা হবে নিজেদের**

কর্ম-সাফল্যে পরিতৃপ্ত। সুমহান জান্নাতে তারা অবান্তর কথা বলবে না। সেখানে থাকবে প্রবাহিত প্রস্রবণ। সেখানে থাকবে উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন শয্যা। প্রস্তুত থাকবে সুরক্ষিত পানপাত্র সমূহ" (৮৮।৮-১৬)।

স্বর্গীয় রমণী হুরীদের কথা ঃ

আল্লার জান্নাতে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বস্তুর হল স্বর্গীয় রমণী বা হুরীগণ। এই হুরীরা হবে চির কুমারী। জান্নাতবাসী মুসলমানরা এদের সঙ্গে যতবারই মিলিত হোক না কেন, প্রত্যেকবার মিলনের পর তারা তাদের কুমারী দেখবে পাবে। এই হুরীদের সকলের বয়স হবে ১৬ বছর এবং তারা যে পোশাক আশাক পরে থাকবে তার বাইরে থেকে ভিতর দেখা যাবে। তারা হবে হরিণ নয়না এবং তাদের চোখ হবে ঘন কালো। তারা হবে সুউচ্চ বক্ষ বিশিষ্ট যৌবনে ভরপুর। তারা তাদের স্বামী ব্যতীত আর কোন পুরুষের দিকে ভুলেও তাকাবে না। তারা হবে অতীব সুন্দরী। এর আগে কোন মানুষ বা জিন তাদের স্পর্শ করেনি। তাদের গায়ের রঙ হবে উটপাখির ডিমের মত। এই হুরীদের কেউ যদি পৃথিবীতে থুতু ফেলতো তবে সার পৃথিবী মৃগনাভীর গন্ধে ভরপুর হয়ে যেত।

ইসলামী স্বর্গের হুরীগণ ঃ

তাই আল্লা কোরানে বলছেন, "**সেখানে থাকবে সুশোভিত উদ্যান ও দ্রাক্ষাকুঞ্জ। আর থাকবে সুউন্নত স্তন বিশিষ্ট ও যৌবনে পরিপূর্ণ স্বর্গীয় রমণীগণ"** (৭৮।৩১)। "**আমি তাদের (স্বর্গবাসীদের) ফলমুল ও মাংসের বিভিন্ন খাবার দেব, যা তারা পছন্দ করে। সেখানে তারা একে অন্যকে পানপাত্র দেবে, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না, এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবে না। তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে মুক্তা সদৃশ কিশোরীরা। আর খাবে সুন্দ্র পাত্রে করে স্বর্গীয় সুরা। সেই সুরা যে যত ইচ্ছা খাবে, কিন্তু তাতে কোন মাথার যন্ত্রণা হবে না। আর থাকবে হরিণ নয়না সুন্দরীগণ"** (৫২।২২-২৪)। "**সুখময় স্বর্গোদ্যানে তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন হবে, তাদের ঘুরে ঘুরে বিশুদ্ধ সুরা শুভ্র উজ্জ্বল পাত্রে পরিবেশন করা হবে, যা পানকারীদের জন্য হবে সুস্বাদু, ওতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং তারা মাতালও হবে না। আর থাকবে সু-আয়তলোচনা আনত নয়ন তন্বীগণ, যার সুরক্ষিত জিম্বের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ"** (৩৭।৪৩-৪৯)।

"**নিশ্চয় সংযমীদের জন্য আছে সফলতা। আছে উদ্যান ও দ্রাক্ষাকুঞ্জ এবং সমবয়স্কার নব যুবতীবৃন্দ; এবং পরিপূর্ণ পান-পাত্র সমূহ"** (৭৮।৩১-৩৪)। '**সেখানে ওরা রেশমের আস্তর বিশিষ্ট পুরো ফরাসে হেলান দিয়ে বসবে, তাদের নিকট দুই উদ্যানের ফল ঝুলবে। সেখানে আয়তনয়না তরুণীগণ থাকবে, যাদের পূর্বে মানুষ অথবা জিন স্পর্শ**

করেনি। এইসব তরুণীরা হবে প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ" (৫৫।৫৪-৫৮)। "সেখানে পরমাসুন্দরী রমণীগণ থাকবে। এই সুলোচনা সুদরীগণ তাঁবুতে অবস্থানকারী। এদের মানুষ বা জিন আগে স্পর্শ করেনি" (৫৫।৭০-৭৪)। "সংযমীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, প্রস্রবণবহুল জান্নাতে। ওরা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি বসবে। ওদের দেব আয়তলোচনা হুরীগণকে। ইহকালে মৃত্যুর পর তারা জান্নাতে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। এটিই তো মহা সাফল্য" (৪৪।৫১-৫৭)। "ওরা সেখানে পান করবে প্রস্রবণ-নিঃসৃত সুরা। সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, বা তারা জ্ঞানও হারাবে না। ওরা পছন্দমত ফলমূল ও ইপ্সিত পাখির মাংস খাবে। তাদের সৎ কাজের পুরস্কার স্বরূপ তারা সেখানে পাবে সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ সুলোচনা সুন্দরীগণ" (৫৬।১৯-২৪)। "তাদের জন্য সম্ভ্রান্ত শয্যাসঙ্গিনী থাকবে। আমি তাদের বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি, ওদের চির কুমারী করেছি। তারা হবে সোহাগিনী ও সমবয়স্কা" (৫৬।৩৪-৩৬)

"জান্নাতে একজন ঘোষক থাকবে। সে ঘোষণা করবে যে, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য সুরক্ষিত আছে চিরস্থায়ী নিরোগ দেহ এবং তোমরা কোনদিন রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হবে না। তোমাদের কোনদিন মৃত্যু হবে না। তোমরা অনন্তকাল ধরে জীবিত থাকবে। তোমরা চিরকাল যুবক থাকবে, কোনদিনও বৃদ্ধ হবে না। এই হল আল্লার জান্নাত, যা তোমরা চিরকাল ধরে ভোগ করবে" (সহীহ্ মুসলীম-৬৮০৩)। জান্নাতের হুরীদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে স্যর ডব্লু মুর বলেন, (Sir W. Muir) বলেন, "যতদিন নবী মহম্মদ মক্কায় এক মাত্র পত্নী খাদিজাকে নিয়ে ঘর করছিলেন, ততদিন হুরীরা ছিল শুধু আল্লার পুরস্কার। কিন্তু খাদিজার মৃত্যুর পর হুরীরা হয়ে উঠল স্বর্গবাসীদের বৈধ পত্নী" (Life of Mahomet, Vocie of India, New Delhi, 1992, pp-76)। তখন আল্লা বললেন, "প্রত্যেক স্বর্গবাসী দু জন করে স্ত্রী পাবে এবং তারা এত ফর্সা হবে যে মাংসের ভিতর দিয়ে তাদের পায়ের গোড়ালির হাড় দেখা যাবে" (সহীহ্ মুসলীম-৬৭৯৩)।

কিন্তু জান্নাতবাসী মুসলমানরা প্রত্যেকে কত জন করে হুরী পাবে সে ব্যাপারে কোন সঠিক নির্দেশ ইসলামী শাস্ত্রে অনুপস্থিত। প্রথমে বলা হল যে প্রত্যেক মুসলমান দু জন হুরী পাবে। কিন্তু নবী মহম্মদ যখন একের পর এক নিকা করতে শুরু করলেন এবং ২২ পত্নীর এক হারেম তৈরি করলেন, তখন জান্নাতে হুরীর বরাদ্দও বাড়তে থাকল। এবং জিহাদে নিহত শহীদদের জন্য ৭২ জন হুরী বরাদ্দ হল। কিন্তু মহম্মদের এক ঘনিষ্ঠ সহচর আবু হুরাইরা বর্ণিত একটি হাদিসের মধ্য দিয়ে আরবের নবী মহম্মদের যে উদগ্র যৌন কামনা ফুটে উঠেছে তা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সেই হাদিসে বলা হচ্ছে, "একজন অতিশয় পতিত ও সকল প্রকার দুষ্কর্মকারী মুসলমানও আল্লার জান্নাতে বিশাল এক জমিদারী পাবে। সেই জমিদারীতে থাকবে বিশাল বিশাল ৭০টা মুক্তার প্রাসাদ। প্রত্যেক প্রাসাদে থাকবে ৭০ চুনীর বাড়ি।

প্রত্যেক বাড়িতে থাকবে পান্না দিয়ে তৈরি ৭০ টা ঘর। প্রত্যেক ঘরে থাকবে ৭০টা চৌকি। প্রত্যেক চৌকির ওপর পাতা থাকবে বিভিন্ন রঙ্কের ৭০টা কার্পেট এবং প্রত্যেক কার্পেটের ওপর বসে থাকবে এক জন করে হুরী। এছাড়া ৭০টা ঘরের প্রত্যেক ঘরে থাকবে ৭০ জন দাসী। আল্লা প্রত্যেক মুসলমানকে এত যৌন ক্ষমতা দেবেন যে, সে সমস্ত হুরী ও দাসীদের সঙ্গে যৌন ক্রিয়া করতে সক্ষম হবে।" হিসাব করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক মুসলমান (৭০×৭০×৭০×৭০×৭০) ১৬৮০৭০০০০০ বা ১৬৮ কোটি ৭ লক্ষ হুরী পাবে। (Ram Swarup, Understanding Islam Through Hadis, Voice of India, New Delhi, 1983, p-205)।

গেলেমানদের কথা ঃ

উপরে আল্লার স্বর্গ বা জান্নতের যে বিবরণ দেওয়া হল, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে তা একটি পতিতালয় বা বেশ্যালয় ছাড়া আর কিছুই নয়। পার্থিব বেশ্যালয়ে যা যা থাকা প্রয়োজন, যেমন সুন্দরী নারী, উৎকৃষ্ট মদ্য, সুস্বাদু খাদ্য ইত্যাদি, আল্লা তার জান্নাতে সে সব কিছুরই অঢেল ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সব থেকে বড় কথা হল, যে কোন পার্থিব পতিতালয়ে ঐ সব ভোগ করতে গেলে টাকা পয়সা খরচ করতে হয়। কিন্তু আল্লার সেই সুপার ডিলাক্স পাঁচ তারা পতিতালয়ে সবকিছুই বিনা পয়সায় পাওয়া যাবে। এসব ছাড়াও অতিশয় দয়ালু দয়াময় আল্লা তার পতিতালয়ে আরও একটা ভোগ্য বস্তুর ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যা কোন পার্থিব পতিতালয়ে পাওয়া দুষ্কর। তা হল সমকাম বা পায়ুকাম করার জন্য অল্প বয়সের কিশোর বালক। আল্লার জান্নাতের অতীব সুদর্শন সেই অল্পবয়সী কিশোর বালকদের নাম হল গেলেমান। আল্লার পতিতালয়ের হুরীদের বয়স যেমন ষোল-র বেশি হবে না, তেমনি গেলেমানদের বয়সও ষোল-র বেশি হবে না। তারা হবে চিরকিশোর।

তাই আল্লা কোরানে বলছেন, **"সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনে সমাসীন হবে, তারা তীব্র গরম বা তীব্র শীত অনুভব করবে না। তাদের উপর সন্নিহিত বৃক্ষ-ছায়া থাকবে, এবং ওর ফলসমূহ তাদের আয়ত্ত্বাধীন করা হবে। সেখানে রজতশুভ্র পাত্রে তাদের পান করতে দেওয়া হবে জান্নাতের সালসাবিল নামক প্রস্রবণের যান্‌যবীল নামক সুমিষ্ট পানি। তাদের সেবায় নিযুক্ত থাকবে চির কিশোরগণ (বা গেলেমানগণ)। তাদের দেশে মনে হবে যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা"** (৭৬।১৩-১৯)। **"ওরা থাকবে সুখ সম্পদের স্বর্গোদ্যানে। —ওরা সেখানে স্বর্ণখচিত আসনে বসবে, পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে হেলান দিয়ে বসবে এবং তাদের সেবায় নিযুক্ত থাকবে চির কিশোররা"** (৫৬।১২-১৭)।

জান্নাত নামক আল্লার সেই পতিতালয়ে একজন মুসলমান কত জন গেলেমান পাবে, সে ব্যাপারে মতভেদ আছে। একটা হাদিস বলছে যে, ছোট বড়, সব মুসলমানই ১০০০ গেলেমান

পাবে। মহম্মদের এক অনুচর আনাস বর্ণিত একটি হাদিস বলছে, প্রত্যেক স্বর্গবাসী মুসলমান ১০,০০০ গেলেমান পাবে। আবু সঈদ বর্ণিত একটি হাদিস মতে কেউ ১০০০-এর কম এবং ৮০,০০০-এর বেশি গেলেমান পাবে না। (Ram Swarup, ibid, p-205)

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পার্থিব পতিতালয়ের মত আল্লার পতিতালয়েও সুরা, নারী ও সুস্বাদু খাদ্য বস্তু থাকবে, তবে কিছু তফাৎ থাকবে। যেমন (১) আল্লার পতিতালয়ের সুরা যে যত খুশি খাক না কেন, তাতে কারও মাথার যন্ত্রণা হবে না। (২) আল্লার পতিতালয়ে কারও মল মূত্র ত্যাগ করার প্রয়োজন হবে না এবং সেখানে কারও সর্দি কাশি বা অন্য কোন অসুখ বিসুখ হবে না। (৩) আল্লার পতিতালয়ে সবাই সুস্বাদু জান্নাতি খাবার খাবে, জান্নাতি গাছের অতিশয় সুস্বাদু ফলমূল খাবে। (৪) সেখানে তারা যে সুন্দরী রমণীদের পাবে তারা হবে হরিণ নয়না ১৬ বছর বয়সী চির কুমারী এবং তারা যে সব পোশাক পরবে তার বাইরে থেকে ভিতর দেখা যাবে। (৫) তারা এত ফর্সা হবে যে তাদের গোড়ালির হাড় পর্যন্ত দেখা যাবে। (৬) সেই সুন্দরীদের সঙ্গে যৌন মিলন ৬০০ বছর স্থায়ী হবে (Aldous Huxley, Moksha, Chatto & Windus, London, 1980, p-112)। (৭) এ ছাড়া আল্লার সেই পতিতালয়ে থাকবে ১৬ বছর বয়সী সুন্দর সুন্দর হাজার হাজার কিশোর বালক, যাদের সঙ্গে জান্নাতবাসীরা মনের সুখে সমকাম বা পায়ুকাম করবে। সব থেকে বড় কথা হল, আল্লার এই পতিতালয়ে যাবার জন্যই দুনিয়া ভর্তি মুসলমান নামাজ, রোজা আর হজ করে চলেছে।

আল্লার পতিতালয়ের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য ঃ

এ টি এম রফিকুল হাসান নামে একজন আলেম **আট বেহেস্ত ও সাত দোজখ** (মুসলীম লাইব্রেরী, কলকাতা) নামে একখানা অতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন, যাতে জান্নাত নামক আল্লার পতিতালয়ের ব্যাপারে আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে আলোকপাত করে তিনি সমগ্র মানব সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন। যেমন আল্লার জান্নাতের একটা আঙুরে যে রস হবে তাতে একটা পিপে ভর্তি হয়ে যাবে। আল্লার জান্নাতের একটা খেজুর হবে ১২ হাত লম্বা এবং তাতে কোন বীচি থাকবে না। আল্লার জান্নাতের গাছপালা হবে বিচিত্র রকম। তারা যে কোন রকমের নড়াচড়া তো করবেই, এমন কি হাঁটাচলাও করবে। যদি কোন জান্নাতবাসী দূরবর্তী কোন গাছের ফল খেতে ইচ্ছে করে, তবে সেই গাছ তার কাছে এগিয়ে আসবে এবং মুখে ফল গুঁজে দেবে।

আগেই বলা হয়েছে যে, কোন জান্নাতবাসী কোন হুরীর সঙ্গে রতিক্রিয়া শুরু করলে তা ৬০০ বছর স্থায়ী হবে। কিন্তু তার বীর্য স্খলন কেমন হবে? এ ব্যাপারে আলোকপাত করে রফিকুল হাসান মহাশয় মনুষ্য জাতির যে উপকার করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি লিখছেন যে, আল্লার রসুল মহম্মদকে এক অনুচর এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে মহম্মদ বলেন

যে, আল্লার জান্নাতে বীর্য ও তার স্খলন হবে পার্থিব বীর্য ও তার স্খলন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জান্নাত নামক আল্লার পতিতালয়ে বীর্য হবে সুগন্ধী বাতাসের মত এবং সেই বীর্য স্খলনের সময় একজন জান্নাতবাসী যে আনন্দ পাবে তা পার্থিব বীর্য স্খলনের থেকে লক্ষ গুণ বেশি। তাছাড়া, পার্থিব বীর্য স্খলন মানুষকে দুর্বল করে দেয় এবং মিলনের ইচ্ছাকেও কমিয়ে দেয়। আল্লার পতিতালয়ে সেই অদ্ভুত বীর্য স্খলন মানুষকে লক্ষ গুণ শক্তিশালী করবে এবং মিলনের ইচ্ছাকেও লক্ষ গুণ বাড়িয়ে দেবে।

জিহাদ হল আল্লার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা ঃ

প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম কোন ধর্মমত নয়। মানুষের আধ্যাত্মিক বা চারিত্রিক উন্নতির বিষয়ে ইসলামের কোন মাথাব্যথা নেই। **ইসলাম হল একটি রাজনৈতিক মতবাদ, যার উদ্দেশ্য হল এই পৃথিবীর সমস্ত দেশকে ইসলামী দেশ বা দার-উল-ইসলাম-এ পরিণত করে সমগ্র বিশ্বে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা।** কিন্তু কি উপায়ে এই লক্ষ্যে পৌছুতে হবে? এখানেই জিহাদ তত্ত্বের আগমন। জিহাদের মধ্য দিয়েই এই পৃথিবীতে ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা জিহাদকে বলেন পবিত্র যুদ্ধ (Holy War)। ইসলামের ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে অজ্ঞ আমাদের দেশের লেখকরা জিহাদকে বলেন ধর্মযুদ্ধ (Righteous War)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্মযুদ্ধ হল ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে যুদ্ধ। অথবা ন্যায়নিষ্ঠ লোকেদের সঙ্গে অন্যায়কারী দুষ্ট লোকদের যুদ্ধ। হিন্দুর এই ধর্মযুদ্ধে যে কোন অসামরিক ব্যক্তি নারী, শিশু, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধারা শুধু অবধ্যই নয়, তাদের হত্যা করা মহাপাপ। মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হল ধর্মযুদ্ধের এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে ন্যায়নিষ্ঠ পাণ্ডবদের ও অন্যায়কারী কৌরবদের সঙ্গে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

কিন্তু ইসলামী জিহাদ পবিত্র যুদ্ধও নয় এবং ধর্মযুদ্ধও নয়। সোজা কথায় বলতে গেলে, **ইসলামী জিহাদ হল পৃথিবীর সমস্ত অমুসলমান কাফেরদের পাইকারী দরে হত্যা করার বর্বর নির্দেশ। জিহাদ হল পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যতরকম বর্বরতার অনুষ্ঠান হয়েছে তার মধ্যে বর্বরতম ও সর্বাপেক্ষা পাশবিক হত্যালীলা।** তিনটি ইংরাজী শব্দের মাধ্যমে জিহাদের বর্বরতাকে প্রকাশ করতে সুবিধা হয়, তাহল by sword, fire and rape বা **তরবারি, আগুন ও ধর্ষণের মধ্যে দিয়ে নারী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বিশেষে কাফের হত্যা করে তাদের সহায়, সম্বল, ধন-দৌলত লুটপাট করে তাদের জমি জায়গা দখল করার নামই জিহাদ।** এভাবেই পৃথিবীর সমস্ত দেশকে ইসলামী দেশ বা দার-উল-ইসলামে পরিণত করে সমগ্র বিশ্বে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটাই কোরানের নির্দেশ। **এভাবেই পূর্ব বাংলার সমস্ত হিন্দুদের জমি জায়গা দখল করে, তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে আজকের ইসলামী বাংলাদেশ তৈরি হয়েছে।**

আগেই বলা হয়েছে যে, ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল, সারা পৃথিবীতে ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তার করা। সমগ্র পৃথিবীকে ইসলাম তথা আরবের সাম্রাজ্যে পরিণত করা। যেহেতু জিহাদ হল এই সাম্রাজ্য বিস্তারের সামরিক অঙ্গ, তাই **ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম**। এই কারণে **আল্লা প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ করেছেন** (কোরান-২/২৪৪)। **যারা জিহাদে যোগ না দিয়ে ঘরে বসে থাকে, তাদের নিন্দা করেছেন** (ঐ-৪/৮-২৯) এবং **কাফেরদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে মুসলমানদের অত্যন্ত নির্মত হতে বলেছেন** (ঐ-৪/৮-২৯)। জিহাদের গুরুত্ব এতই অপরিসীম যে, **আল্লা একদিনের জিহাদকে হাজার দিনের নামাজের সমান করে দিয়েছেন এবং জিহাদকারীর জন্য রোজা সম্পূর্ণ মাফ করে দিয়েছেন**। ৬২৪ খৃষ্টাব্দের রমজান মাসে মুসলমানদের সঙ্গে মক্কার কোরেশদের বদর যুদ্ধ সংগঠিত হয়। রমজান মাস রোজার মাস। যুদ্ধের আগে **মহম্মদ সর্বপ্রথম নিজে রোজা ভাঙেন এবং অন্য সবাই পরে রোজা ভাঙে।**

জিহাদে উদ্দীপিত করার জন্য **আল্লা জিহাদ-লব্ধ লুঠের মাল বৈধ করে দিয়েছেন। জিহাদ-লব্ধ কাফের নারীও লুটের মাল বা গণিতের মাল। তাই আল্লা জিহাদ-লব্ধ কুমারী, সধবা, বিধবা, বৃদ্ধা যে কোনরকমের কাফের নারী মুসলমানদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন।** জিহাদে উদ্দীপিত করতে আল্লা আরও বলেছেন, "**অংশীবাদী কাফেরদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের জন্য ঘাঁটি গেড়ে ওঁৎ পেতে থাকবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে**", (কোরান-৯/৫)। "**যেখানেই তাদের পাবে হত্যা করবে**" (ঐ-২/১৯১)। "**তাদের গ্রেপ্তার কর, যেখানে পাও হত্যা কর, তাদের মধ্যে থেকে সাহায্যকারী গ্রহণ করো না**" (ঐ-৪/৮৯)। "**অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমার নিকটবর্তী তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর এবং ওরা তোমাদের কঠোরতা দেখুক**" (ঐ-৯/১২৩)। "**আমার সৎকর্মশীল বান্দারাই পৃথিবীর অধীশ্বর হবে**" (ঐ-২১/১০৫)। "**তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, যতক্ষণ না অশান্তি দূর হয় এবং আল্লার রাজত্ব কায়েম হয়**" (ঐ-৪৭/৪)। "**তাদের হত্যা কর, কিংবা তাদের শুলবিদ্ধ কর, অথবা তাদের হস্তসমূহ ও পদসমূহ বিপরীত দিক হতে কর্তন কর**" (ঐ-৫/৩৩)। "**ওরাই অভিশপ্ত এবং ওদের যেখানে পাওয়া যাবে সেইখানেই ধরা হবে এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হবে**" (ঐ-৩৩/৬১) ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রশ্ন হোল, যেই আল্লা এইসব কথা বলতে পারে, সেই আল্লা ভগবান হতে পারে কি না? এবং যেই গ্রন্থে এ সব কথা লেখা আছে, তাকে ধর্মগ্রন্থ বলা যায় কি না?

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, ইহ জগতে মুসলমানদের কাছে সর্বাপেক্ষা পুণ্যের কাজ হল অ-মুসলমান বা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। অর্থাৎ, তাদের নির্বিচারে হত্যা করা, তাদের টাকা পয়সা, ধন দৌলত লুঠ করা, তাদের ঘরে আগুন দেওয়া, তাদের রমণীদের উপর বলাৎকার করা, তাদের শিশুদের আছাড় দিয়ে মেরে ফেলা এবং এভাবে

তাদের জমি জায়গা দখল করা। অর্থাৎ, এক কথায় বলতে গেলে, এই জগতে তাদের কাজ হল চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি, আর পর জগতে তাদের উদ্দেশ্য হল জান্নাত নামক অআল্লার সুপার লাক্সারি পাঁচতারা বেশ্যালয়ে গিয়ে হুরী পরীদের সঙ্গে অবিরাম যৌন লালসা চরিতার্থ করা। আল্লা কোরানে কোথাও এ কথা বলেননি যে, ওহে মুসলমানরা, তোমরা সৎ ও নৈতিক জীবনযাপন কর এবং লেখাপড়া শিখে মানুষ হও। পক্ষান্তরে, আল্লার নির্দেশ হল, ওহে মুসলমানগণ, তোমরা অমানুষ ও জানোয়ার হও, যত ইচ্ছা পাপ ও দুষ্কর্ম করতে থাক। যেহেতু তোমরা মুসলমান, তাই কেয়ামত বা শেষ বিচারের দিন আমি তোমাদের পাহাড়-প্রমাণ পাপ ক্ষমা করে দেব।

উপসংহার ঃ

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, যাদের ভগবান এই জগতে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, লুঠ, নারী ধর্ষণ, হত্যা ও যে কোন রকমের অপরাধ করতে উপদেশ দেয় এবং পর-জগতে এক বেশ্যাখানায় গিয়ে চিরন্তন যৌন স্বেচ্ছাচারের লোভ দেখায়, সেই সমাজের লোকদের কি গতি হতে পারে! এরই পরিণতি হিসাবে দেখা যায় যে, সারা বিশ্বে, সমস্ত ব্যাপারে মুসলমানরা হল সব থেকে অনগ্রসর। শ্রী ওয়াসিম সাজ্জাদ হলেন ইসলামাবাদ স্থিত Ministerial Standing Committee on Scientific and Technological Cooperation (CONSTECH), -নামক সংস্থার সভাপতি। বিগত ১৯৯৮ সালে একটি সভায় তিনি দুঃখ করে বলেন যে, ও আই সি (বা Organisation of Islamic Countries) ভুক্ত দেশগুলিতে জনসংখ্যার অনুপাতে ৪০ লক্ষ বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ার থাকা উচিত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই সংখ্যা হল মাত্র ২ লক্ষ। অর্থাৎ, বাঞ্ছিত সংখ্যার মাত্র ৫ শতাংশ। তিনি আরও বলেন যে, সারা পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা ১৩০ কোটি, কিন্তু এই ১৩০ কোটি মুসলমান যে পরিমাণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পত্র প্রকাশ করে তা নামমাত্র, ১ শতাংশরেও কম। সেইরকম, কম্পিউটার সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তির মত আধুনিক প্রযুক্তি বা হাইটেক এর ক্ষেত্রে মুসলমানদের কোন অবদান নেই বললেই চলে।

গত ২০০৬ সালের ৭ই জানুয়ারী আমেরিকান ফেডারেশন অফ মুসলিমস্ অফ ইন্ডিয়ান অরিজিন এবং বাঙ্গালোরের একটি সংস্থা ট্যালেন্ট প্রোমোশন ট্রাস্ট যুগ্মভাবে ইমার্জিং ইন্ডিয়া অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ মুসলিমস্ নামে বাঙ্গালোরে একটা আলোচনা সভার আয়োজন করে। সেই সভায় মুম্বইয়ের চিত্রতারকা ফারুক শেখ বলেন যে, সভ্যতার দৌড়ে মুসলমানরা কেন সকলের পিছনে পড়ে আছে সে ব্যাপারে মুসলমানদের উচিত কঠোরভাবে আত্মানুসন্ধান করা। তাছাড়া শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে তারা কেন সকলের তলায় পড়ে আছে সে ব্যাপারে অন্যের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে নিজেদের দোষত্রুটিগুলোর প্রতি নজর দেওয়া। তিনি আরও

বলেন যে, এইসব বিষয়গুলোকে যথাযথ বিচার বিবেচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এসবের মূলে রয়েছে ধর্মের নামে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা, নারী জাতির উপর দমন পীড়ন। মুসলমান সমাজের দারিদ্রের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, দক্ষিণ ভারতের মুসলমানদের অবস্থা বলতে গেলে অনেক ভাল। যে কেউ উত্তর ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়েছেন, তিনিই মুসলমান সমাজের জীবনধারণের অতিশয় নিম্নমান লক্ষ্য করেছেন। শুধুমাত্র ধর্মীয় যাকাতের মাধ্যমে এই দারিদ্র দূর করা একেবারেই অসম্ভব (ইসলামিক ভয়েস, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬)।

জনাব হিসামুল ইসলাম সিদ্দিকি হলেন দিল্লী স্থিত ইন্ডিয়ান ইসলামি কাউন্সিল নামক সংস্থার সভাপতি। গত ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে ইসলামিক হেরিটেজ ঃ ইন্ডিয়ান ডাইমেনশন শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় জনাব সিদ্দিকি বলেন যে, ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের মধ্যে প্রায় ৩৬ শতাংশ হল শহরবাসী (urban) এবং এদের প্রায় সকলেই বস্তিবাসী এবং দারিদ্র সীমার নিচে এদের অবস্থান। মুসলমানদের মধ্যে অজ্ঞতার অন্ধকার ও সৃষ্টিশীলতার চূড়ান্ত অভাব সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা ইসলামিক ভয়েস-এর সম্পাদক জনাব সাদাতুল্লা খাঁ বলেন যে, মুসলমান সমাজের বৌদ্ধিক স্থবিরত্ব ও সৃষ্টিশীলতার অভাব সত্যিই একটি লজ্জার বিষয়। ইন্টেলেকচুয়াল স্ট্যাগনেশন অ্যান্ড ইটস রেমেডি শীর্ষক একটি নিবন্ধে তিনি বলেন, ব্যক্তিগত দিক দিয়েই হোক আর সমাজগত দিক দিয়েই হোক, উভয় দিক দিয়েই মুসলমান সমাজ বৌদ্ধিক স্থবিরত্বের শিকার। বিগত বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলমান সমাজ সভ্যতার দৌড়ে অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে সকলের পিছনে পড়ে রয়েছে (ইসলামিক ভয়েস, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬)।

সমগ্র আরব দুনিয়াতেও ওই একই চিত্র বিদ্যমান। সাধারণতঃ আরব লীগ-এর অন্তর্গত ২২টি দেশকে আরব দুনিয়া (Arab World) বলা হয়ে থাকে। যদিও এই আরব দুনিয়ার লোকেরা তত দরিদ্র নয়, তবুও জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তারা অনগ্রসর। এই আরব দুনিয়ার বেশিরভাগ দেশই প্রাকৃতিক তেল, গ্যাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। তাছাড়া বহু বছর আগেই তারা বিদেশি পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। তবুও সেখানকার লোকরা কেন এত অনগ্রসর? এই প্রশ্নের একটা যুক্তিযুক্ত উত্তর খোঁজার জন্য গত ২০০১ সালে রাষ্ট্রসংঘের একটি শাখা সংস্থা ইউনাইটেড নেশনস্ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UNDP) আরব জগতের বিখ্যাত জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতদের নিয়ে একটা অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে। মিশরীয় পণ্ডিত জনাব নাদের ফেরগনি ছিলেন তাদের প্রধান।

প্রায় ১ বছর ধরে ঐ কমিটি অনুসন্ধান চালায় এবং ২০০২ সালের জুলাই মাসে কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্ট আরব হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০২ নামে খ্যাত। কোন একটি দেশের অবস্থান নির্ণয় করতে ইউ এন ডি পি একটা সূচক ব্যবহার করে,

যাকে বলে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স (HDI)। এই সূচক নির্ণয় করতে মাথা পিছু আয়, মানুষের গড় আয়ু, বয়স্কদের নিরক্ষরতা, কত শিশু স্কুলে যায় ইত্যাদি বিষয়গুলো দেখা হয়। ইউ এন ডি পি আরও একটা সূচক ব্যবহার করে, যাকে বলে অল্টারনেটিভ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স (AHDI)। এই সূচক নিণ ?য় করার বেলায় মাথাপিছু আয়কে বাদ দিয়ে তার বদলে অন্য কয়েকটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়, যেমন সেখানকার জনসাধারণ কতটা মৌলিক অধিকার ভোগ করে, তাদের কতটা বাক স্বাধীনতা আছে, কত লোক সেখানে ইন্টারনেট ব্যবহার করে, সেই দেশ বাতাসে কত কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়ে ইত্যাদি। রিপোর্টে দেখা যায় যে, এই দুই সূচকের ক্ষেত্রেই আরব দুনিয়ার স্থান প্রায় সকলের নীচে।

আরব জগতের এই অনগ্রসরতার জন্য আরব হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০২-এর প্রণেতারা প্রাকারান্তরে ইসলামকেই দায়ী করেছেন। স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর ইসলামী প্রতিবন্ধকতাই যে মুসলমান সমাজকে অনগ্রসর করে রাখছে, এ ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত। ইসলামের কড়া নির্দেশ হল, আল্লা কোরান ও হাদিসের মধ্য দিয়ে সত্য প্রকাশ করে গিয়েছেন এবং মুসলমানদের কাজ হল সেই সত্যকে গভীরভাবে বিশ্বাস করা, সেই সত্যকে ব্যাখ্যা করা ও তাকে ছড়িয়ে দেওয়া। সেই সত্যকে প্রশ্ন করা বা অবিশ্বাস করা নয়। উপরন্তু, আল্লা যখন সত্য প্রকাশ করে গিয়েছেন, সেই সত্যকে আকড়ে ধরে থাকা। নতুন করে সত্য আবিষ্কার করার জন্য বৃথা পরিশ্রম করা নয়। এই ইসলামী মনোভাবই যে সমগ্র মুসলমান সমাজকে পিছন থেকে টেনে ধরছে, সভ্যতার দৌড়ে অনগ্রসর করে রাখছে, তা বলাই বাহুল্য।

এটা সকলেরই জানা আছে যে, ২০০৪ সালে বর্তমান ইউ পি এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৫ সালের ৯ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী শ্রী মনমোহন সিং মুসলমান সমাজের সমস্যা সম্বন্ধে সঠিকভাবে অবগত হবার জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী রাজেন্দ্র সাচারের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি সাচার কমিটি নামে খ্যাত। শ্রী রাজেন্দ্র সাচার ব্যতীত এই কমিটিতে আরও ৬ জন সদস্য ছিলেন। তাঁদের নাম হল সর্বশ্রী সৈয়দ হামিদ, টি কে ওমান, এম এ বসিথ, আখতার মজিদ, আবু সালেহ শরীফ এবং রাকেশ বসন্ত। প্রায় ২০ মাস পরে, ২০০৬ সালের ৩০শে নভেম্বর এই কমিটি ৪০৩ পৃষ্ঠার রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেয়। ঐ রিপোর্ট ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের অনগ্রসরতার এক করুণ চিত্র তুলে ধরেছে।

উপরিউক্ত সাচার কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় যে, স্কুল ও কলেজে মুসলমান ছাত্র ছাত্রীর দেখা পাওয়া গেলেও, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে। তেমনি সরকারি ও বেসরকারি চাকরী, কোর্ট কাছারি, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীতেও মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, একমাত্র জেলের কয়েদীদের মধ্যে

মুসলমানদের সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে বেশি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কেরালায় মুসলমানদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২৪.৭ শতাংশ। কিন্তু সেখানে জেলের কয়েদীদের ৩৮.৩ শতাংশ মুসলমান। সেইরকম, দিল্লীতে মুসলমানদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১১.৭ শতাংশ, কিন্তু সেখানে জেলের কয়েদীদের ২৯.১ শতাংশ মুসলমান।

এদিক দিয়ে মহারাষ্ট্রের স্থান সব থেকে উপরে। সেখানে মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০.৬ শতাংশ মুসলমান, কিন্তু জেলের কয়েদীদের ৪০.৬ শতাংশ মুসলমান। এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা অনেক বেশি। বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, এই জগতে যাদের পুণ্যের কাজ হল চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি, আর পর জগতে যাদের উদ্দেশ্য হল জান্নাত নামক আল্লার সুপার লাক্সারি পাঁচতারা বেশ্যালয়ে গিয়ে হুরী পরীদের সঙ্গে অবিরাম যৌন লালসা চরিতার্থ করা, তাদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি আর কি আশা করা যেতে পারে।

লেখক পরিচিতি

ডক্টর রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিভাগের কৃতী অধ্যাপক এবং কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ ও নরেন্দ্রপুরস্থ রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন কৃতী ছাত্র। পদার্থবিদ্যার গবেষক হওয়া সত্ত্বেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন বিশেষ করে হিন্দু শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদাদির দর্শন, হিন্দু সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ, পাণ্ডিত্য ও উপলব্ধি তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রতিফলিত হচ্ছে। বর্তমানে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক।

লেখকের অন্যান্য বই ঃ